৫০ বছরে নারী শিক্ষার অগ্রগতি

নাজনীন আখতার ঢাকা

ব্যানবেইস ২০১৯ অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষায় মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর হার প্রায় ৫১ শতাংশে উন্নীত হয়েছেফাইল ছবি

দেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে মাত্র ৩৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে রাজধানীর সবুজবাগে যাত্রা শুরু করে কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল অ্যান্ড কলেজ। তখন বিদ্যালয়টিতে ছাত্রী ছিল ১৭ জন। আশির দশকে এই স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৩০০ জনে উন্নীত হয়, ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় এক-তৃতীয়াংশে। কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. সাইফুল আলম প্রথম আলোকে জানান, এখন সেখানে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষার্থীর ৪৯ শতাংশই ছাত্রী।

স্বাধীনতার পর প্রায় পাঁচ দশকে শিক্ষায় নারীরা যেভাবে এগিয়েছে, তার প্রতিচ্ছবিই যেন কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল অ্যান্ড কলেজটি। তৎকালীন শিক্ষা অধিদপ্তরের ‘অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন পাবলিক ইন্সট্রাকশন ফর দ্য ইয়ার ১৯৭০-৭১’ প্রতিবেদন অনুসারে, তখন দেশের মোট শিক্ষার্থীর ২৮ শতাংশের কিছু বেশি ছিল ছাত্রী। সরকারের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০১৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষায় মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর হার প্রায় ৫১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকেও প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী ছাত্রী। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেয়েদের হার কিছুটা কম, ৩৮ শতাংশ।

সরকারি প্রতিবেদন, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মতে, সরকারি সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি, অভিভাবকদের সচেতনতা এবং শিক্ষার মর্যাদা উপলব্ধি থেকে শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণের হার দিন দিন বাড়ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার প্রথম আলোকে বলেন, বাল্যবিবাহ, দারিদ্র্য, বখাটেদের উৎপাতসহ নানা কারণে মেয়েদের শিক্ষা ব্যাহত হলেও সার্বিকভাবে সাধারণ শিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষা—মেডিকেল, প্রকৌশল এবং কারিগরি সব

ক্ষেত্রে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের হার বেশি। উপবৃত্তিসহ নানা সুযোগ-সুবিধার কারণেও অনেক অভিভাবক মেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন।

১৯৭৩ সালে কদমতলা স্কুলটির প্রথম ভর্তি হওয়া ছাত্র ছিলেন ইয়াহিয়া সোহেল। তিনি এখন স্কুলের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। প্রথম আলোকে বললেন, তাঁদের স্কুলে এলাকার দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেক মেয়েও পড়ছে। দরিদ্র পরিবারগুলোও এখন মেয়েদের পড়ালেখা করার গুরুত্ব বুঝতে পারছে।

নারী শিক্ষা ১৯৭১ থেকে বর্তমান

ব্যানবেইসের আর্কাইভ থেকে পাওয়া ১৯৭০-৭১ সালে দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এর আগের বছরের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। এতে দেখা যায়, ওই বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষায় হঠাৎ পিছিয়ে যায় দেশ। স্বাধীন বাংলাদেশ ওই পিছিয়ে যাওয়া অবস্থা থেকে নারী শিক্ষা নিয়ে শুরু করে নতুন যাত্রা।

'অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন পাবলিক ইন্সট্রাকশন ফর দ্য ইয়ার ১৯৭০-৭১' প্রতিবেদন অনুসারে, ওই সময় দেশে মোট শিক্ষার্থীর ২৮.৪ শতাংশ ছিল মেয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে

১৮৮টি অনুমোদিত ডিগ্রি কলেজে ৯ শতাংশের বেশি এবং তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ শতাংশের মতো ছাত্রী ছিলেন। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৯৪৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী ছিলেন ১ হাজার ২৯৪ জন। তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (এখন বুয়েট) ১ হাজার ৭১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিলেন ১২ জন। ময়মনসিংহে অবস্থিত একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৭৮১ শিক্ষার্থীর মধ্যে কোনো ছাত্রীর তথ্য নেই প্রতিবেদনে। ১০টি আইন কলেজ ও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ৩ হাজার ৭১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ৩৬ জন, সরকারি তিব্বিয়া কলেজসহ ৯টি মেডিকেল কলেজে ৩ হাজার ৩৪৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিলেন ৬১১ জন। ২টি কমার্স কলেজ ও ৫টি কমার্শিয়াল স্কুলে ৪ হাজার ৩১ জনের মধ্যে ছাত্রী ৫৫ জন, চিত্রাঙ্কন ও হস্তশিল্পের ১টি কলেজ ও ২টি স্কুলে ২৯৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৮৭ জন। ৬ হাজার ১৪৭টি সরকারি ও বেসরকারি সিনিয়র মাদ্রাসা, জুনিয়র মাদ্রাসা, হাফিজিয়া ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় ৭ লাখের বেশি শিক্ষার্থী থাকলেও ছাত্রীর সংখ্যা কত ছিল, সে তথ্য দেওয়া নেই প্রতিবেদনে।

এর আগের বছরে ১৯৬৯-৭০ সালে প্রাথমিকে ৩৪ শতাংশের বেশি এবং মাধ্যমিকে প্রায় ২৯ শতাংশ মেয়ে পড়ত।

১৯৭২-৭৩ সালে ৩২ শতাংশের কিছু বেশি মেয়ে শিক্ষার্থী ছিল। প্রাথমিকে মেয়ে ছিল প্রায় ৩৫ শতাংশ। ১৯৭৩-৭৪ সালে ২৯ শতাংশ মেয়ে শিক্ষার্থী ছিল দেশে। প্রাথমিকে মেয়ের হার ছিল ৩৩ শতাংশ।

ব্যানবেইস ২০১৯ অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকেও প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী ছাত্রীফাইল ছবি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে ১৯৮১ সালে প্রথম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করা হয়। এরপর ১৯৯২ সালে এটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং ২০০৩ সালে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে গড়ে ওঠে। ২০০৩ সালে প্রাথমিকে মেয়ে

শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ৪৯ শতাংশ। মাধ্যমিকে গ্রামীণ পর্যায়ে প্রায় ৫৪ এবং শহরাঞ্চলে এ হার ৫১ শতাংশের কিছু বেশি ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেন্ডার অ্যান্ড স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজের মতে, প্রাথমিকে মেয়ে শিক্ষার্থীর হার বেশি বলে আত্মতৃপ্তিতে ভুগলে হবে না। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষার সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ন জড়িত। তাই উচ্চশিক্ষাতেও যেন নারীর অংশগ্রহণ বাড়ে সে লক্ষ্যে নারীবান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। অনেক অভিভাবক প্রাথমিক শিক্ষা দিলেও উচ্চশিক্ষায় মেয়ের জন্য বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হন না।

২০১৫ সালে পেশাদারি শিক্ষায় ৩৯, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে (১৬২টি) ৪৩, দাখিলে ৫৯, আলিমে ৫৪ শতাংশের বেশি এবং কারিগরি শিক্ষায় মেয়ে শিক্ষার্থীর হার ছিল প্রায় ২৪ শতাংশ। ব্যানবেইসের সর্বশেষ ২০১৯ সালের প্রতিবেদন অনুসারে, ১৩ ধরনের পেশাগত শিক্ষায় ৫৪, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক (ভকেশনাল) শিক্ষায় ২৫ শতাংশের কিছু বেশি, ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলে (১৪৫টি) প্রায় ৪৪ এবং দাখিলে ৬০ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী মেয়ে।

মেয়েদের পাস বেড়েছে

রাজধানীর বাসাবো এলাকায় স্বামীর সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ দোকানে চটপটি বিক্রি করেন এক নারী। স্বামী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। আর তিনি নিজে কখনো স্কুলের গণ্ডিতে পা রাখেননি। তবে পড়াশোনায় মেয়ের আগ্রহ দেখে ভর্তি করে দেন স্থানীয় এক স্কুলে। মেয়েটি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। মা-মেয়ের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে কথা হয়েছে প্রথম আলোর। পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক মেয়েটি জানান, তাঁর আশপাশে পড়ালেখা দেখিয়ে দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। এমনও হতো, ঠিকঠাক বুঝে পড়তে না পেরে ফেলও করেছেন। কিন্তু মায়ের অনুপ্রেরণা ও শিক্ষকদের সহায়তায় তিনি একপর্যায়ে ভালো ফল করতে শুরু করেন।

ব্যানবেইসের ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৮ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে মেয়েদের পাসের হার আড়াই গুণ বেড়েছে। ১৯৯০ সালে ৩০ শতাংশ মেয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় পাস করেছিল। ২০১৯ সালে পাস করেছে ৮৩ শতাংশের বেশি মেয়ে। ১৯৯০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় পাস করেছিল ৩১ শতাংশ মেয়ে। আর ২০১৯ সালে পাস করেছে প্রায় ৭৫ শতাংশ মেয়ে।

ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হারও দিন দিন কমছে। ২০০৫ সালে ৪৭, ২০১০ সালে প্রায় ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। ২০১৯ সালে এ হার নেমে এসেছে প্রায় ১৮ শতাংশে।

উপবৃত্তির সুফল

দরিদ্র পরিবারের শিশুদের স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করা, শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি বাড়ানো ও ঝরে পড়া ঠেকাতে সরকার ১৯৯৩ সালে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি হাতে নেয়। শহর এলাকা বাদে ২৭ শতাংশ এলাকায় এ কর্মসূচি ছিল। ১৯৯৯ সালে পৌর এলাকা বাদে অবশিষ্ট ৭৩ শতাংশ এলাকার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্রছাত্রীদের মাসে ২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি দেওয়া শুরু হয়। এখন প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের জন্য মাসে ১০০ টাকা এবং প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাসে ১৫০ টাকা হারে উপবৃত্তি দেওয়া হয়। যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত খোলা হয়েছে, সেসব স্কুলের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাসে ২০০ টাকা করে উপবৃত্তি দেওয়া হয়। মাধ্যমিকেও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে স্নাতক (পাস) কোর্সের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেওয়া হয়। বিভিন্ন শর্তের ভিত্তিতে ৩০ শতাংশ ছাত্রী ও ১০ শতাংশ ছাত্রকে এই উপবৃত্তি দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার দেওড়া পশ্চিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মাজহারুল হক খান প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর স্কুলে উপবৃত্তির কারণে ঝরে পড়া কমেছে এবং উপস্থিতি বেড়েছে। স্কুলের ৩৭৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্ধেকের বেশি মেয়ে। তাঁর এলাকায় প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার প্রায় শতভাগ।